BL College Journal
Full PDF
www.blcollege.edu.bd
ISSN 2664-228X (Print)
ISSN 2710-3684 (Online)
Volume -IV, Issue-I, July 2022
Pp. 30-38

অমর মিত্রের ধুলোগ্রাম : বাস্তুহীনের বিকল্প 'জামতলি'

শ্রাবন্তী মজুমদার

শ্রাবন্তী মজুমদার
গবেষক, বাংলা বিভাগ
রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
e-mail: shrabanmegh@gmail.com

সারসংক্ষেপ

স্মৃতি এবং পুনর্বাসনের মধ্যে দিয়ে যে সাহিত্যধারা গড়ে উঠেছিল অমর মিত্র মূলত সেই ধারার লেখক। ছেড়ে যাওয়া প্রতিবেশী-পরিজনের কষ্ট, অবদমিত আবেগ ও ছিন্নমূল হওয়ার বেদনায় লেখা স্মৃতিকথা দিয়েই পার্টিশন সাহিত্যের সূচনা। অমর মিত্র মূলত এই ধারারই লেখক। তাঁর কাছে দেশভাগ মানেই সব শেষ হয়ে যাওয়া নয় বরং দেশভাগের ৭৪ বছর পেরিয়ে এসেও এই আলোচনা প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে কেন না এটা প্রমাণিত যে ১৯৪৭ সালেই সব কিছু শেষ হয়ে যায়নি, তিনটি প্রজন্মের পরেও দেশভাগ পরবর্তী প্রজন্মের জন্য এই বেদনা, এই দহন শিকড়সন্ধানী করে তুলবে। দেশভাগ যেমন একটি বেদনাদায়ক ঘটনা পাশাপাশি এই বিষয়ে নিমজ্জিত হয়ে আলোচনার পরিসরও কম বেদনাদায়ক নয়। সেই বিচ্ছেদ বেদনার বিস্মৃতি রাশি হয়েই অমর মিত্রের কাছে দেশভাগ বা দেশত্যাগের মানবিক ট্রাজেডি অনিবার্যভাবেই উঠে এসেছে যার নির্মম সাক্ষ্য বহন করে চলেছে খণ্ডিত বাংলার চলমান সাহিত্য। তাঁর ধুলোগ্রাম উপন্যাস যেন সার্বিকভাবে ধারণ করে আছে দুই পারের ইতিহাসকে। ছেড়ে আসার যন্ত্রণা এবং আবার নতুন করে গড়ে তোলার সংকল্পের মধ্যে দিয়েই দৃঢ় হয়ে উঠেছে এর কাহিনি। ১৯৪৭ -এর দেশভাগ এবং ১৯৪৮ -এর শেষ দিকে খুলনার দাঙ্গার ফলে পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গে বিপুল সংখ্যক শরণার্থী এসে ভিড় করে। বেসামাল পরিস্থিতিকে আয়ত্তে আনতে চেয়ে তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৫০ -এ নেহেরু-লিয়াকত চুক্তি ঠিক হয় এবং তাতে বলা হয় ৩১-শে ডিসেম্বরের মধ্যে উদ্বাস্তুরা যদি ফিরে যায় তবে পূর্ববঙ্গ সরকার তার সম্পত্তি ফিরিয়ে দেবার দায়িত্ব গ্রহণ করবে। কিন্তু এই প্রস্তাবও শৃঙ্খলা দিতে পারেনি বরং বিক্ষোভের মাত্রাকে বাড়িয়ে দিয়েছিল। অগণিত বাস্তুত্যাগী মানুষদের বিপর্যয়ের মধ্যে দিয়েই পুনর্বাসন বা সম্পত্তি একচেঞ্জের খেলা চলে যার কোনোটাই পরিপূরক ছিল না। কিছু মানুষ তাদের নিজেদের পুনর্বাসনের দায়িত্ব নিজেরাই হাতে তুলে নিয়েছিল, গড়ে তুলেছিল উদ্বাস্তু কলোনি। এই কলোনিগুলিকে কেন্দ্র করে এবং অবশ্যই কলোনিবাসীদের অধিকার ও অধিকৃত জমির আইনি স্বীকৃতির দাবিতে এপার-ওপারের বাঙালির যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত, প্রতিহিংসা, আবেগ- বিহ্বলতা কাজ করেছে তারই এক জীবন্ত ভাষ্য ধরা রয়েছে অমর মিত্রের ধুলোগ্রাম উপন্যাস।

মূলশব্দ

দেশভাগ, উদ্বাস্তু, কলোনী, আত্মপরিচয়ের সংকট, সামাজিক শ্রেণিবিন্যাস

ভূমিকা

দেশভাগোত্তর কালে জন্মভূমি ছেড়ে যাওয়া এক দেশত্যাগী পরিবারের সন্তান অমর মিত্র। তাঁর জন্ম ১৯৫১-তে, দেশভাগের তিন বছর পরে। তিনি না দেশভাগ দেখেছেন না তিনি দাঙ্গার সাক্ষী। শৈশব থেকে বড় হতে হতে মায়ের মুখে হারানো গ্রাম, হারানো নদী, হারানো স্বজনের কথা শুনতে শুনতে তিনি বিভাজিত বেদনাকে ধারণ করেছেন। তাই অমর মিত্রের লেখায় দেশভাগ এসেছে মূলত স্মৃতির সূত্রে। অমর মিত্র নিজে এ প্রসঙ্গে যা জানান–

> 'ভালমন্দ দুই শুনেছি। কারো মুখে সাম্প্রদায়িক ঘৃণার কথা যেমন শুনেছি, তেমনি বাড়ির অসাম্প্রদায়িক চেহারাও দেখেছি। ভাল-মন্দ দুই দেখতে দেখতে, ওপারে সব খুইয়ে আসা পরিবারের এপারে ভেসে এসে ভেসে যাওয়া দেখতে দেখতে, মানুষের বেদনার কথা অনুভব করতে করতে আমার নিজের ভিতরে হারিয়ে যাওয়া দেশ যেন মহাবৃক্ষের ছায়া ফেলে রেখেছে।'[১]

১৯৯৩ সালে কাঁটাতার উপন্যাসের মধ্যে দিয়েই মূলত অমর মিত্রের দেশভাগ সংক্রান্ত রচনার সূত্রপাত হয়। স্বদেশ থেকে উৎখাত কিছু মানুষের সংকট এবং টিকে থাকার লড়াইয়ের সমন্বয়ে উপন্যাসটি বিস্তৃতি লাভ করলেও বোঝা যায় তা একান্তই আত্মজনের ইতিবৃত্তে আবদ্ধ থেকে গেছে। *কাঁটাতার* (১৯৯৫) রচনার পর বেশ কিছু বছর অমর মিত্র দেশভাগের রচনা থেকে দূরে ছিলেন। পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় দেশভাগ সম্পর্কিত রচনাগুলি তিনি লিখেছেন মূলত ২০০০ থেকে ২০১৫ এই সময়সীমার মধ্যে। বিভাজনের যন্ত্রণায় দগ্ধ হয়েই তাঁর লেখনী নতুন করে দেশ চিনিয়ে দেয়। তাঁর অধিকাংশ লেখাতেই এক বিমূর্ত কনসেপ্ট হিসেবে উঠে আসে 'দেশ' নামক শব্দটি। ছেড়ে যাওয়ার মর্মবেদনা দ্বারাই কি নির্মিত হতে পারে দেশ না কি নতুন বাসস্থান যেখানে নির্মিত হয় সেটাই হয়ে ওঠে দেশ এই দ্বান্দ্বিকতা থেকেই উঠে এসেছে অমর মিত্রের গুরুত্বপূর্ণ কিছু ছোটগল্প এবং উপন্যাস তো বটেই। মূলত আখ্যানের মধ্যে দিয়ে শিকড়ের অনুসন্ধান করেছেন লেখক। তাঁর এই ধারার প্রবেশদ্বার বলা যেতে পারে *ধুলোগ্রাম* (২০০১) উপন্যাসটিকে। ছেড়ে আসার যন্ত্রণা এবং আবার নতুন করে গড়ে তোলার সংকল্পের মধ্যে দিয়েই দৃঢ় হয়ে উঠেছে এর কাহিনি।

ধুলোগ্রাম এমনই এক বাস্তুচ্যুত পরিবারের আখ্যান যারা অগণিত উদ্বাস্তু মানুষের মতো দেশ ছেড়ে আসেনি, দাঙ্গা বা হানাহানি তাদের মারাত্মক ভাবে ছুঁতে পারেনি। হয়তো ক্ষোভে, আবেগে কিছুটা নিপীড়িত হয়ে স্বদেশ ত্যাগ করেছিল এবং এই স্থানান্তরের সঙ্গেও ছিল সম্পত্তি এক্সচেঞ্জের সুযোগ। ফলে এই পরিবারের কাছে দেশভাগ মানে যতটা যন্ত্রণা তার চেয়ে আবেগ বেশি। বরং পূর্ববাংলার সাতক্ষীরার এই সম্ভ্রান্ত পরিবার একটি নদীর ব্যবধানে পশ্চিমবাংলায় এসে যথেষ্ট সমাদর পায়। আর্থিক সঙ্গতি, স্বচ্ছল জীবনযাত্রা, শিক্ষা এবং পারিবারিক সম্ভ্রমের কারণে এই পরিবারের কাউকেই 'রিফ্যুজি' বলে তিরস্কার করা হয় না। এই একান্নবর্তী পরিবারের কনিষ্ঠ সদস্য শুভ। তার বাবা-কাকা সবাই চাকুরে। কিশোর শুভ তার ঠাকুমার মুখে পূর্ববাংলার

গল্প শুনে অবকাশ যাপন করে। এই পরিবারের একমাত্র বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা ছাড়া কেউই খুব একটা ভাবিত হয় না দেশভাগ নিয়ে। কিন্তু শুভদের বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে গড়ে ওঠা উদ্বাস্তু কলোনিতে ঠিক এর বিপরীত ছবি। তারা আর্থিক ভাবে পিছিয়ে তো বটেই সঙ্গে প্রতিনিয়ত তারা ছিন্নমূল, উদ্বৃত্ত, 'রিফ্যুজি' বলে লাঞ্ছিত হয়। পূর্ব বাংলার 'আমতলি' গ্রাম থেকে আসা এই মানুষগুলি এপারেও বিকল্প এক 'আমতলি' গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখে। উদ্বাস্তু কলোনিতে গিয়ে শুভ তার কালোঠাম্মার মুখে ফেলে আসা দেশ গাঁয়ের গল্পকে যেন চাক্ষুষ করতে পারে। উপন্যাসটি এভাবেই একটি পরিবার এবং একটি উদ্বাস্তু পাড়ার সামাজিক ও ব্যবহারিক অবস্থানের টানাপোড়েনে গড়ে উঠেছে। পশ্চিমবাংলার স্থায়ী অধিবাসীদের কাছে উদ্বাস্তু হেনস্থার দিকটি যেমন গুরুত্ব পেয়েছে তেমনি উঠে এসেছে ভাষাগত বিরোধ। এই কেন্দ্রীয় চরিত্র শুভ শেষে বাবার কর্মসূত্রের কারণে বসিরহাট ছেড়ে মাকে নিয়ে পাড়ি দিয়েছে দূর বাঁকুড়ায়, তার দেশভাগের গল্প শোনা অভ্যেসে ধীরে ধীরে এক বৃহত্তর জগতে গিয়ে মিশেছে।

বিশ্লেষণ

দেশভাগের প্রথম পনেরটি বছরের সময়কাল এই উপন্যাসটিকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। দেশভাগের চার বছর পরে জন্মানো শুভ জ্ঞানত জানে না তারা কি হারিয়েছে। ওপারে যে তাদের সবকিছু ছিল সেটা যেমন তার কাছে রূপকথার জন্ম দেয় ঠিকই সঙ্গে রোমাঞ্চও আনে। শুভ তার মা প্রতিমা দেবীর কাছে শোনে–

> 'ওপারের মানুষ তারা। সব বিক্রিবাটা করে এপারে না এসে উপায় ছিল না। দাঙ্গা লেগেছিল চতুর্দিকে, কিন্তু তাদের গ্রাম ছিল ব্যতিক্রম। মা বলে ধুলোগাঁর মানুষ নাকি জানতই না দেশভাগ হয়ে গেছে। না হিন্দু না মুসলমান। জেনেছে ক'দিন বাদে। জানার পর গ্রাম জুড়ে কান্নার রোল উঠেছিল। মা বলে, সেই কান্না এখনও যেন মায়ের কানে লেগে আছে। তবু ওপারে থাকা যেত ভবিষ্যৎ ভেবে সব আস্তে আস্তে চলে আসছে।'[২]

কিশোর শুভ ভাবে তাহলে কী ছিল সেই ভবিষ্যৎ যা স্বদেশে পূরণ সম্ভব নয়, কী বা সে দেশত্যাগের মহিমা যা স্বপ্নের হাতছানি দেয়। আসলে এসব কিছুই ধোপে টেকে না। অমর মিত্র আসলে বোঝাতে চান ভূমিহীনেরা এভাবেই বারবার বিশ্বাসভঙ্গের মধ্যে দিয়ে বাস্তু বদলানোর অভ্যাসকে রপ্ত করে। মানুষের অস্তিত্বে মিশে থাকা সেই স্থানান্তরের রীতি কী তাই অমর মিত্রের লেখনীতে প্রকট হয়ে ওঠে! পাঠককে এই প্রশ্ন বিদ্ধ করে। শুভর ঠাকুরদা অবনীমোহনও নানা গল্প সম্ভারের নিক্তিতে দেশভাগকে মাপেন। অবনীমোহন বিশ্বাস করেন দুই দেশের মধ্যবর্তী সীমান্তরেখা একদিন মুছে যাবে, তারা পুনরায় ধুলোগ্রামে প্রত্যাবর্তন করবেন। অবনীমোহনের গল্পের পরিধিও ঠিক এটুকুই। কিন্তু এখান থেকেই শুরু হয়ে যায় এই আখ্যান– পিতৃপুরুষদের কথা বেয়ে বেয়ে এবং সেই পশ্চাদপসরণ দ্বারাই গড়ে তোলে দেশকাল ভাবনা। ঠাকুর্দা এবং কালোঠাম্মার এই গল্পকথাকে বেদনার উওরাধিকারের মতো ধারণ করে শুভ। অবনীমোহন বারান্দায় দাঁড়িয়ে পূর্বদিকে তাকিয়ে তার ভিটেমাটি খোঁজার মধ্যে আসলে নিজেকে খুঁজে চলেন। তার আক্ষেপ একটুর জন্য খুলনা জেলা ইন্ডিয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়নি বলে। অন্যদিকে প্রতি সন্ধ্যেবেলায় নাতি-নাতনিদের কাছে ছেড়ে আসা দেশের গল্প বলে যায় শুভর কালোঠাম্মা। সে গল্পে শুধু বাস্তুত্যাগী মানুষগুলিই নয়, বরং সেখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হয়ে ওঠে অধর প্রামানিকের মৃত স্ত্রী বিদ্যেবতীর প্রেতাত্মা। পারিবারিক বিন্যাস, শুভ, আমতলা কলোনি-এসব কিছুই স্মৃতি হাতড়ানো সম্বল, যা

লেখককে দিয়ে লিখিয়ে নেয় একটি জাতির অন্তর্বেদনার করুণ আলেখ্য।

বসিরহাটের ওপারের সাতক্ষীরার, কপোতাক্ষের তীরের গ্রাম আমতলির অধিবাসীরা উদ্বাস্তু হয়ে এপারে এসে চেয়েছে একটি বিকল্প আমতলি গড়ে তুলতে। এর মধ্যে তারা যে শিকড় খুঁজে নিতে চায় তা আসলে অমর মিত্রের একটি বাসনা, তিনি মনে মনে চান হয়তো অন্তত যা দিয়ে দেশভাগ ও বাস্তুহীনতাকে ভুলে থাকা যায়। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র শুভর মধ্যেই আত্মগোপন করে থাকেন অমর মিত্র স্বয়ং। আমতলার মানুষেরা তাদের প্রিয় নদী, জমি, বাস্তু, বাগান সব রেখে এসেছে কিন্তু সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে জন্মগ্রামের স্মৃতি। সেই স্মৃতি বয়ে তারা সীমান্ত পার করেও একটি রিফ্যুজি কলোনিকে 'আমতলি' নামে ডেকে সান্ত্বনা পেতে চেয়েছে। তাদের সেই প্রয়াস বিদ্রূপে অবহেলায় মুখ থুবড়ে পড়েছে। রিফ্যুজি এবং রিফ্যুজি পাড়া– এই শব্দ যুগলকে মুছে ফেলতে চেয়েছে কয়েকজন সর্বহারা মানুষ। রিফ্যুজি শব্দটির মধ্যে যে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য তা শুভ বোঝে কিন্তু একটা সময়ে সেও মনে-প্রাণে আমতলিবাসীর একজন হয়ে ওঠে। সে সহ্য করতে পারে না তাদের অপমান বরং উপলব্ধি করে আমতলির ছিন্নমূল মানুষগুলির মতো তারাও রিফ্যুজি। আমতলির মানুষকে বারবার রিফ্যুজি বলে অপমান করার ভিতরে ওপার থেকে আসা সব মানুষের প্রতি অবহেলা দেখানোর যে অভিসন্ধি রয়েছে তা শুভকে পীড়িত করে। দিদি জুঁইয়ের সঙ্গে সে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছে–

> 'জুঁই বলল, রিফ্যুজি পাড়া যেতি হবে না, গিয়ে বাঁদর হবি, গালাগালি শিখবি। আমরাও তো রিফ্যুজি। জুঁই অবাক হয়ে যায় শুভর মুখে এই কথা শুনে, কী বললি আমরা রিফ্যুজি? তাই তো, তুই তো রিফ্যুজি, আমি বরং এ পারে হয়েছি, ইন্ডিয়ার লোক, ভারতের লোক, যারা যেখেনে জন্মায় তারা সেখেনের লোক হয়। জুঁইয়ের আত্মসম্মানে লেগেছে ঝাঁপিয়ে পড়ল শুভর উপর, কলোনির লোক যা বলে তাই শিখছিস তুই, ওরা রিফ্যুজি বলে সবাই তা হবে?'[৩]

এই পরিবারটি সমাজের উচ্চবর্ণেরই শুধু নয়, তাদের পাকা ঘর এমনকী তার কাকা নীলরতনবাবু যে তহসিলদার, বা তার বাবা কলকাতায় সরকারি চাকরি করেন সর্বোপরি ক্ষমতাবান বলে তাদের রিফ্যুজি বলে অবহেলা করায় যে একটা ঝুঁকি আছে সেটা শুভর বুঝতে অসুবিধা হয়নি। শুভ প্রথম দিকে তার কালোঠাম্মার কাতর অনুরোধে আমতলি গেলেও পরে সে নিজের ভিতরেই অনুভব করেছে অজানা-অব্যক্ত এক আকর্ষণ। তাই এপারের দেশীয় মানুষদের মনে আমতলির মানুষের প্রতি যে ঘৃণা উৎসারিত হয়েছে তা থেকে সে নিজেকে বিযুক্ত বলে ভাবতে পারে না। শুভর এই ব্যথা, মনে মনে উচ্ছিন্ন মানুষগুলির দোসর হয়ে ওঠার অব্যক্ত অনুভূতি আর কেবল তার একার থাকে না, তা সর্বজনের বেদনায় ব্যাপ্তি লাভ করে। এক সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে এই দেশহারা মানুষের অভিমান এবং ক্ষোভকে তুলে ধরেন লেখক–

> 'ব্যক্তির শোক নয়, এই শোক সর্বজনের। এপারে যারা এসেছে তাদের শোক, ওপারে যারা রয়ে গেছে তাদেরও। দুর্গাপুজো করা মানুষের শোক, মসজিদে নামাজ পড়া মানুষের শোক। দাঙ্গার ভয়ে প্রাণ হাতে করে চলে আসার সময় কেউ আশ্রয় নিয়েছিল ইয়ার আলির বাড়ি, কেউ ইয়াকুবের ঘরে। কিন্তু দেশ তো ছেড়েছে ধর্মের কারণে, তাই দেশ হারানোর শোকে ওইসব ঘটনাগুলো তুচ্ছ হয়ে গেছে, ব্যক্তির ঔদার্য সমষ্টির স্বার্থকে রক্ষা করতে পারে না বলে মনে মনে রাগও আছে। সেই রাগ, আমতলির হারানোর অপমানকে ভুলতে

> আমতলির মানুষ এই ব্রহ্মপুরের প্রান্তে গড়ে তুলেছে আমতলি। তাদের অভিমান মুসলমানের উপর, তাদের রাগ দেশনেতৃত্বের উপর। মহাত্মা গান্ধী, নেহেরু, কায়েদ-ই-আজম, মহম্মদ আলি জিন্নার উপর। এদের উপর শোধ নিতেই যেন এই আমতলির পত্তন। তারা সামান্য মানুষ, কেউ তাঁত টেনে জীবিকা নির্বাহ করত, কেউ কপোতাক্ষয় মাছ ধরে, কেউ হাঁড়ি কলসি তৈরি করে, জমিতে লাঙল ঠেলে ভাতের জোগাড় করত, তারা ইতিহাস জানে না। জানে এই সত্য যে দেশটাকে দু-খণ্ড করে দিয়েছে কংগ্রেস, মুসলিম লিগ, ব্রিটিশ মদত দিয়ে গেছে। যারা দেশ ভেঙেছে তারা তাদের চেয়ে অনেক শক্তি ধরে, তারা সামান্য বল নিয়ে পাল্লা দেওয়া আরম্ভ করেছে।'[৪]

পারিবারিক গণ্ডী ছাড়িয়ে শুভর আরেকটি আইডেন্টিটি সে ব্রহ্মপুর উচ্চশিক্ষা নিকেতনের ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র-শুভময় বসু। তার স্কুলজীবন, শিক্ষক, সহপাঠীদের সঙ্গে কাটানো সময়ের প্রেক্ষিতে যে জগৎ সে দেখতে পায় সেখানে হিন্দু-মুসলমান বা অন্যান্য নিম্নবর্গীয়ের পারস্পারিক অবস্থান বুঝিয়ে দেয় দেশভাগের মতোই মানুষের মানসিকতার বিভাজনও সমান ভয়ঙ্কর।

অমর মিত্র বোধহয় তাঁর ধুলোগ্রাম উপন্যাসটি স্তর পরম্পরার মাধ্যমে ধরে রাখতে চান একটি দীর্ঘ সময়ের ইতিহাসকে। দেশভাগ বা একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধেই যে জীবন অতিবাহিত হয়ে গেল তার ভয়াবহ ক্ষতগুলিকে মুদ্রিত করার প্রয়াসই হয়তো তাঁকে এই আখ্যান সম্প্রসারণে রসদ যুগিয়েছে। 'আমতলি' পত্তন তাই একটা প্রতীকী হয়ে থেকে যায়–

প্রথমত : আমতলি পত্তন সে যে দেশেই হোক না কেন সেটাই মানুষের একটি প্রবৃত্তি। মানুষ যে আদিকাল থেকে যাযাবর বৃত্তির গণ্ডী ভেঙ্গে বাস্তু গড়ে থিতু হতে চেয়েছে তা ইতিহাস পরম্পরার মধ্যেই ধরা রয়েছে। ফলে কপোতাক্ষ তীরের একদল মানুষ উর্বরা ভূমিতে ঘর বেঁধে, জন্ম-মৃত্যু-অভিঘাতের মধ্যে দিয়ে এগিয়েছে। তাদের হৃদয়ের গহীনে আমতলি দৃঢ়ভাবে প্রথিত হয়ে গেছে। কিন্তু দেশভাগ তাদের সেই শিকড়কে উপড়ে দিয়েছে। আবার অন্ন এবং বাসস্থানের সন্ধানে বেরিয়ে পড়েছে আমতলিবৃন্দ। আদিকালের সেই বিস্মৃত অভ্যাস দেশভাগের অভিঘাতের মধ্যে দিয়ে ফিরে এসেছে মানবজাতির এক ক্ষুদ্র অংশের কাছে। শোকে আকুল যূথবদ্ধ মানুষগুলি সব ছেড়ে ভাঙা পরিবার নিয়ে সীমান্তমুখী হয়েছে। তারা চলতে চলতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছে একদা দূর অতীতে যে আমতলি তাদের যাযাবর বৃত্তি ভুলিয়েছিল সেই আমতলিকেই বাঁচাতে তারা পার হয়েছে দেশ, বিদ্ধ হয়েছে কাঁটাতারে।

দ্বিতীয়ত : নারী এবং পুরুষের মধ্যে দেশভাগ কীভাবে এসেছে, কত মর্মান্তিক ভাবে তার ছায়া ফেলেছে সেদিকে আলোকপাত করেছেন অমর মিত্র। তিনি *ধুলোগ্রাম* উপন্যাসে বলছেন–

> 'পুরুষরা সীমান্ত পার হতে হতে তাদের পরিবার পরিজনের হাত ধরে শাপান্ত করছিল সেইসব মহাজনদের, যারা তাদের গ্রাম ত্যাগ করতে বাধ্য করেছে। তারা ঝুঁকে পড়ে কাঁদছিল, তারা আমতলিতে জন্মাত, আমতলিতে বাঁচত, আমতলির নদীতে, মাটিতে শ্রম করে অন্নের ভাবনা দূর করত। তারা তাদের হাত পা পেশী নিয়ে কোন নদীতে, কোন মাটিতে যাবে? মানুষের বাসভূমির তো নিজস্বতা চাই।'[৫]

আসলে এক্ষেত্রে পুরুষের ক্রন্দন ছিল পেটের খিদে আর মাথার উপর এক টুকরো আচ্ছাদনের জন্য আর নারীর ক্রন্দনে এসব কিছুর সঙ্গে আরো ছিল আব্রু রক্ষার লড়াই। আমতলিকে কেন্দ্র করেই লেখক নারীর রোদনকে ব্যক্ত করেছেন। নারীদের শোকের আকুলতায় আমতলি ব্যতীত পাশাপাশি গ্রাম জনপদও উঠে এসেছে কারণ তারা কেউ হয়ত সংসার করতে এসেছে আমতলিতে বা আমতলি ছেড়ে অন্য গ্রামে পাড়ি দিয়েছে। ফলে সেইসব যুবতী, বৃদ্ধাদের যে নদী যে গ্রাম এক সময় সুখে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে পিতৃগৃহে বা পতিগৃহে তারাই আবার সর্বহারা হয়ে পাড়ি দিয়েছে অন্যদেশে। অথবা অধিকাংশ নারী হয়তো ধর্ষিতা হয়েই ঢলে পড়েছে মৃত্যুর কোলে। নারীর বেদনাই কি তাহলে অমর মিত্রকে অধিক তাড়িত করেছে? সে প্রশ্ন থেকেই যায়–

> 'তারা সন্তানধারণ করে বলে গৃহ-গ্রাম-নদী যাত্রাপথ সব যে সন্তানের মতো ধরে রেখেছিল বুকের অন্তস্তলে। সব হারিয়ে তারা পার হয়ে এসেছিল সীমান্ত। হাঁটতে হাঁটতে, নতুন মাটির দিকে যাত্রা করার সময়ে তারা কেঁদেছিল কখনও পতিগৃহের আমগাছটির জন্য, কখনও পিতৃগৃহের ধবলী গাইটির জন্য। হয়তো বা কেঁদেছিল পিতৃগৃহে ফেরার সময় বেত্রবতী বা কপোতাক্ষ তীরে অপরাহ্ন বেলায় নমাজ পড়তে বসা বৃদ্ধের জন্যও তাদের কাছে ব্রহ্মপুরের এই আমতলি আগের আমতলির ছায়া মাত্র।'[৬]

যেভাবে জয় গোস্বামীকে লিখে যেতে হয় 'নন্দর মা' কবিতা তেমনি অমর মিত্রকেও লিখে যেতে হয় কালোঠাম্মাদের অন্তহীন পালিয়ে বেড়ানোর কথা। শুধু তাই নয় বিধবা এবং মানসিক ভারসাম্যহীন মানুষেরাও বিশেষভাবে উঠে আসে অমর মিত্রের লেখায়। কালোঠাম্মার সই হরিমতি এবং তার পাগল ছেলেকে কিভাবে পূর্ববঙ্গের ধুলোগ্রাম থেকে এনে আমতলিতে ঠাঁই দেওয়ানো যায় সেই প্রয়াস একটি চিঠির আকারে উঠে এসেছে। হরিমতির উদ্দেশ্যে কালোঠাম্মার লেখা এই চিঠিখানি উপন্যাসকে অন্য মাত্রায় পৌঁছে দেয়–

> 'স্নেহের হরিমতি, পত্রদ্বারা কুশল জানিয়ো, তোমাকে আমরা পাকিস্তানে ফেলিয়া আসিয়াছি না, না, আমরা তো নয়, আমরা হবে কেন? ফেলে এসেছে তো ওর ভাসুর দেওর, তবু আমরাই লিখতে হবে, তারা ফেলে আসুক, আমরা তো ডাকতে পারতাম পাগল ছেলে আর তার বুড়ি বিধবা মারে ফেলে রেখে চলে এল সবাই, সবাই যেন পাথরের মতো, বলে নাকি পাগলকে ওপারে ফেলে রেখে তার মাকে চলে আসতে। মানুষ কী নিষ্ঠুর রে, মানুষ পারে এসব!'[৭]

নারীদের কাছে দেশভাগ কতটা গভীর ছিল অমর মিত্র সে কথা বারবার উচ্চারণ করেছেন। শুধু অমর মিত্রই না, অন্যান্য সাহিত্যিকদের থেকেও আমরা জেনেছি দেশভাগ নারীকে কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। উর্বশী বুটালিয়া তাঁর *The Other Side Of Silence* বইটিতে রিফ্যুজি নারীর নীরবতার বিষয়ে বলতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন- 'Words would suddenly fail speech as memory encountered something too painful, often frightening to allow it to entire speech.'[৮] লক্ষ করা যায় যে যখনই তিনি মহিলাদের সঙ্গে কথা বলতে গেছেন লক্ষ করেছেন তারা নিশ্চুপ থাকতেই অধিক স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছেন। দুঃস্বপ্নময় অভিজ্ঞতা যেন তাদের মূক ও বধির করে তুলেছে। মনের গভীরে এই ক্ষত এতটাই প্রভাব ফেলেছে যে তারা কেউ মুখ খুলতে চায়নি, বা কেউ শুরু করলেও কথা বলতে বলতে স্মৃতির কাছে আত্মসমর্পণ করে হঠাৎ নীরব হয়ে গেছে। অমর মিত্রের ঠাকুমা নিজে দেশভাগের অভিমানে এপারে এসে কখনো দুর্গাপুজোয় মেতে উঠতে পারেননি সে কথা তিনি তাঁর

স্মৃতিকথায় জানিয়েছেন। তিনি পিতামহীর বেদনাকে গভীর ভাবে অনুভব করেছেন। সেই অনুভূতি দিয়েই যেন ধুলোগ্রাম উপন্যাসের দেশত্যাগী কালোঠাম্মা চরিত্রটি নির্মাণ করেছেন লেখক। কালোঠাম্মার কাছে গল্প মানেই স্মৃতিচারণ। আসলে কালোঠাম্মার বিষয়টা একই, শুধু পরিবেশনের গুণে তা স্তর পরম্পরায় বিন্যস্ত হয়েছে। তবে কালোঠাম্মা সর্বাধিক যে গল্পটি পরিবেশন করে তা বিদ্যেভূতকে নিয়ে, যার সত্যিকারের কোনো অস্তিত্বই নেই। তাহলে অস্তিত্বহীন স্মৃতিকেও কী অমর মিত্র যাপন করতে চান! লেখকের মনোজগৎ নিঃসৃত স্মৃতিরা একে একে দানা বাঁধে, আর তা দিয়েই দেশভাগের বেদনাকে বহুমাত্রিকতায় তুলে ধরেন। ফলে কালোঠাম্মার গল্পগুলিও 'ঠাকুমার ঝুলি'র পরম্পরা বহন করতে থাকে এবং তা সঞ্চারিত হয় প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে।

দেশভাগের মতো বড় বিষয়ই শুধু নয়, সামাজিক রাষ্ট্রিক যে কোনো সংকটে নারীকেই সবচেয়ে বেশি ভুক্তভোগী হতে হয় সেটাই অমর মিত্রকে পীড়িত করেছে। বালিকা, যুবতী, বধূ, বিধবা এবং মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন মানুষদের নিয়ে যে প্রান্তীয় জগৎ এই উপন্যাসে বিধৃত হয়েছে তা দেশভাগের পরিপ্রেক্ষিতে দেশমাতৃকার লাঞ্ছনার ইতিবৃত্ত রচনা করে। আর তাই পূর্ব পাকিস্তানের ধুলোগ্রাম, আমতলি থেকে দেশচ্যুত মানুষেরা পশ্চিমবঙ্গের ইছামতী সংলগ্ন বসিরহাট অঞ্চলে গড়ে তোলে বিকল্প এক আমতলি। যে আমতলি এদেশীয়দের কাছে নিতান্ত রিফ্যুজি পাড়া নামে ব্যঙ্গবিদ্রূপে পর্যবসিত হয়। 'রিফ্যুজি' এবং 'বাঙাল'- এই শব্দ যুগল ক্রমশ অমার্জিত হতে হতে নিতান্ত গালাগালিতে পরিণত হবার মধ্যে যে বেদনা লুকিয়ে থাকে তা সমগ্র বঙ্গভূমি এবং বাংলা ভাষাকে কালিমালিপ্ত করে। ধুলোগ্রাম উপন্যাসের ধুলোবালিময় সাধারণ মানুষেরা তাদের মৌখিক ভাষা আর চিরকালীন নদীপ্রীতি নিয়ে উদ্বাস্তু হয়। তাদের সঙ্গে গ্রাম, পাড়া, রাস্তা, খেতসহ পেরিয়ে আসে পূর্ববঙ্গে ফেলে আসা গৃহবধূ বিদ্যেবতীর ভূত নিজে–

> 'কালোঠাম্মা ওই কাহিনী বলে না সন্ধ্যেয়। এখন তার মুখে শুধু অধর পরামানিকের বউ-এর গল্প। যে গল্পের টানে অন্ধকারে পরামানিকের বউ বোধহয় বর্ডার পার হয়ে, ইছামতী নদী পার হয়ে, বাঁশবন বিলবাওড় পেরিয়ে কালোঠাম্মার খুব কাছে এসে দাঁড়ায়। বউ উঠোনে দাঁড়িয়ে যেন ফিসফিস করে, চলি এলে পিসি, আমার যে মনখারাপ করে খুউব, আমি কাদের নে থাকব পিসি, তুমি ছাড়া যে কেউ ছেল না আমার।'[৯]

পাঠকের বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না বিদ্যেবতীর ভূত আসলে একটি পিছুটান। এই পিছুটান আপামর বাংলা ভাষাভাষী মানুষের। যত মানুষ ওপার থেকে এপারে এসেছিল হয়তো তার তুলনায় এপার থেকে ওপারে যাওয়া মানুষের সংখ্যা কমই ছিল। কিন্তু তাদের অনুভূতিমালা দ্বারা নির্মিত বাস্তুযন্ত্রণা, একটি বাংলাকে ভেঙ্গে দু-টুকরো করার বেদনা রাষ্ট্রনেতাদের বিচলিত করেনি। তাই ওপার বাংলার হিন্দু-মুসলমানের ওতপ্রোত সম্পর্কের সম্প্রীতিটুকুকে বারবার দুটি ভূখণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে তুলে ধরেন লেখক। যুদ্ধ নয়, ভ্রাতৃত্ববোধের অনুপ্রেরণা থেকেই হয়তো অমর মিত্র দেশভাগকে উপস্থাপন করতে চান।

কালোঠাম্মার গল্প বস্তুত অমর মিত্রের মনোজগতের বিনির্মাণ। প্রৌঢ়া এই নারীর দেশত্যাগের কষ্ট আসলে লেখকেরই অর্জিত। ইছামতীর ওপারের ধুলোগ্রাম থেকে এপারের ব্রহ্মপুরের মধ্যবর্তী দূরত্ব মোটে পনেরোটি মাইল হলেও তা পেরোতে কখনো কখনো জীবনও দিয়ে দিতে হয়। উপন্যাসে ওই দূরত্বটুকুই এসেছে রূপক হয়ে। কালোঠাম্মার মতো বুড়ো পশুপতি দাস দেশভাগ এবং বয়সের ভারে ন্যুব্জ। তারই উদ্যোগে ব্রহ্মপুরের

রিফ্যুজি কলোনি আমতলি নামে আখ্যা পায়। অথচ বিস্তর বাধা পোহাতে হয় তাকে। এদেশীয় স্থায়ী মানুষেরা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপেই নয়, চূর্ণ-বিচূর্ণ আঘাতে সেই স্বপ্ন ভেঙে দিতে প্রস্তুত। রিফ্যুজিকে যারা অশ্রাব্য, তাচ্ছিল্য, ঘৃণায় পর্যবসিত করতে চেয়েছে তাদের সম্মিলিত অবজ্ঞার সামনে দাঁড়িয়ে বৃদ্ধ পশুপতি বোঝাতে চেয়েছে তারা ভিখিরি বা চোর নয়, সর্বস্ব হারানোর অতল ব্যথায় লীন হতে হতে তারা শুধু রিফ্যুজিপাড়াকে আমতলিতে রূপান্তরিত করতে চেয়েছে।

অন্যদিকে সম্ভ্রান্ত অবনীমোহন ভেবেছে কলকাতা, নোয়াখালী, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ প্রভৃতি জায়গায় রায়োট হয়েছে কিন্তু তাদের ধুলোগ্রামে তো হয়নি, তবুও কেন সে গ্রাম ছেড়ে আসতে হল। এই প্রসঙ্গটি শুভর ঠাকুরদা অবনীমোহনকেও বারবার প্রশ্নময় করে তুলেছে। শুভর বাবা রামরতন ন্যায়পরায়ণ বলেই তাকে বহু বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। কপোতাক্ষ, কালিহাতি, ব্রহ্মপুর ছেড়ে বাঁকুড়ায় বদলি হয়েছে। তার যে ভাঙন তা ছিল আজন্মকালের। স্বাধীনতার বয়স যখন মাত্র সতের বছর তার মধ্যে বুঝেছেন এর চেয়ে ব্রিটিশ শাসন ভালো ছিল, তারা যতই সম্পদ নিয়ে যাক না কেন তারা বিচার করত। তারা জোচ্চোরকে প্রশ্রয় দেয়নি। রামরতনের এই মোহভঙ্গ আসলে স্বাধীনতার ফাঁকগুলিকে বুঝিয়ে দেয়। রামরতনের মনে হয়েছে দেশভাগ পরবর্তী এই অর্জিত স্বাধীনতার মূল্য অনেক বেশি, কিন্তু রাষ্ট্রক্ষমতার অতি লোভের কারণে স্বাধীনতার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। উত্তর প্রজন্মের শুভ ভেবেছে এই যাযাবর বৃত্তিই জীবন। স্কুলের দিবাকর স্যারের কাছে শোনা নটিলাস নামের ডুবোজাহাজ নিয়ে বর্ডার পেরিয়ে দূর-দূরান্তে পাড়ি দিতে চেয়েছে সে। আসলে এরা প্রত্যেকেই আত্মানুসন্ধানের মধ্যে দিয়ে প্রত্যেকের জাতিগত সংকটকে মোচন করতে চেয়েছে। এভাবেই ছেড়ে আসার যন্ত্রণা এবং আবার নতুন করে গড়ে তোলার সংকল্পের মধ্যে দিয়েই রচিত হয়েছে অমর মিত্রের এই উপন্যাস। উপন্যাসে তিনটি প্রজন্ম তাদের নিজস্ব ভাবনা এবং পরিসরের মধ্যে থেকেই দেশভাগকে বুঝতে চেয়েছে। কালোঠাম্মার গল্প বলা জগৎ, পশুপতির আমতলি গড়ে তোলার স্বপ্ন, অবনীভূষণের স্মৃতি রোমন্থন- এসব কিছু পার্টিশন উত্তর ভাবনা জাত। তাই তারা সবাই সেখানেই ব্রহ্মপুর-আমতলিতেই থেকে যায়। আর রামরতন তার নিষ্ঠার দ্বারা যে জগতের সন্ধান পায় সেই কর্মময় জীবনে নিজের স্ত্রী-পুত্রকে বসিয়ে চলে যায় আমতলি ব্রহ্মপুর ছেড়ে। এবং শুভ কালোঠাম্মার অপরিসমাপ্ত গল্প হৃদয়ে ধারণ করে পৌঁছে যেতে চায় পার্টিশনের গ্র্যান্ড ন্যারেটিভে।

উপসংহার

একজন সাহিত্যিকের কাজই হল সৃজনশীলতার মধ্যে দিয়ে নিরন্তর অনুসন্ধান চালিয়ে যাওয়া, যে অনুসন্ধানে বেঁচে থাকে তাঁর সত্তা। দেশভাগ অমর মিত্রের সত্তার সঙ্গে নিবিষ্ট হয়ে আছে। দেশভাগ তিনি দেখেননি, তবে তিনি দেখেছেন স্বাধীনতা। নামপরিচয়হীন অসহায়, বঞ্চিত মানুষগুলি যেভাবে প্রতিনিয়ত একটি দেশ খুঁজে বেড়ায় সেভাবে অমর মিত্রও হারানো দেশ হারানো শিকড়ের সন্ধানে নিজেকে নিযুক্ত রাখেন। আর তাই তিনি আজও দেশ এবং মানচিত্রের মধ্যবর্তী দূরত্ব-চিহ্ন নিয়ে ভাবিত হন, স্বদেশ অনুসন্ধানে নেমে রচনা করে চলেন একের পর এক নির্বাসিতের আখ্যান। আর অমর মিত্র নিজে যেন তাঁর সৃষ্ট চরিত্রের অন্দরে অবগাহন করে ছুঁয়ে যেতে চান এই মর্মবিষাদ।

তথ্যসূত্র

১। অমর মিত্র, *ভাসিয়ে দিয়েছি কপোতাক্ষ জলে*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, মে ২০১৬, পৃ. ১৭৮

২। অমর মিত্র, *হারানো দেশ হারানো মানুষ*, সোপান পাবলিকেশান, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০১৬, পৃ. ৪০

৩। ঐ, পৃ. ৬১, ৬২

৪। ঐ, পৃ. ৫৪

৫। ঐ, পৃ. ৬২

৬। ঐ, পৃ. ৬৩

৭। ঐ, পৃ. ১৭২

৮। Urvashi Vutalia, *The Silence Of Other Side,* Penguin books india, 1998, Gurgaon, Pp. 24

৯। অমর মিত্র, *হারানো দেশ হারানো মানুষ*, সোপান পাবলিকেশান, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০১৬, পৃ. ২৪১